ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন ও ছাত্রদের কর্তব্য

৭০-এর দশকের সূচনায় যে প্রশ্নটি জনসাধারণ, বিশেষত ছাত্র ও যুবকদের আলোড়িত করেছিল, তাহল যখন ভারতবর্ষের অন্যত্র নানাস্থানে কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের শাসন-শোষণের জমানা ও ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভের স্ফূরণ ঘটছিল, তখন বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ বলে বিবেচিত পশ্চিমবাংলায় কেন কোন কার্যকরী গণআন্দোলন গড়ে উঠছিল না। ১৯৭৪ সালে কলকাতায় অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস্ অরগানাইজেশন-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আহূত এক সভায় প্রদত্ত এই ভাষণে কমরেড ঘোষ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাগুলি যার পরিণতিতে এই ব্যর্থতা, তার বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তিনি ছাত্রদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনে উচ্চতর রুচি-সংস্কৃতির অপরিহার্য ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তারই ভিত্তিতে ছাত্রদের আন্দোলন সংগঠিত করা খুবই জরুরি বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

কমরেডস্ ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

সারা ভারত ডি এস ও'র বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ছাত্র সমাবেশে আমাকে বর্তমান পরিস্থিতি ও ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি এক কথায় বলতে গেলে অত্যন্ত সঙ্কটজনক এবং যেকোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষের কাছেই তা চূড়ান্ত উদ্বেগজনক। বহুদিক থেকেই এ কথাটা সত্য। দেশে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য যে হারে বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতির অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান হারে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, তার উপর পুঁজিবাদী শোষণের চাপে, বিশেষ করে ভারতীয় পুঁজিবাদ যে ধরনের পুঁজিবাদ এবং তার যে বিশেষ প্রকৃতি ও চরিত্র, তার চাপে, জনজীবন আর্থিক দিক থেকে দুঃখ-দুর্দশার প্রায় চরমে পৌঁছেছে।

অথচ একটা আশ্চর্যের বিষয়, এই দেশেই দুঃখ-দুর্দশা যখন এতটা ব্যাপক আকারে দেখা দেয়নি, চারিদিক থেকে অবস্থা যখন এত খারাপ হয়নি, তখনও দেশের মানুষ, যুবসম্প্রদায় ও ছাত্রসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিন্দুমাত্র অন্যায় কোথাও ঘটতে দেখলে তার বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো, জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে, ক্ষমতা থাকুক না থাকুক অবস্থা অনুযায়ী সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পা বাড়িয়েছে। খবরের কাগজগুলো তাদের ব্যবসায়ী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত, অন্তত আজকের মতো নির্লজ্জভাবে অন্যায়ের সমর্থনে কাঁদুনি গাইত না এবং অন্যায়কারীদের আড়াল করার চেষ্টা করত না, বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলনকারী তাদের সংবাদ না ছাপাবার এবং জনসাধারণের সামনে তাদের তুলে না ধরার চক্রান্ত করত না। অথচ এই সমস্ত ঘটনাগুলোই বর্তমানে ঘটছে। এই সমস্ত কিছু মিলে দেশের অবস্থা আজ একটা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন।

নীতি-নৈতিকতার সঙ্কটই বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

এখন, দেশে চারিদিক থেকে এই যে একটা সর্বাত্মক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে জনগণ, ছাত্রসমাজ, মজুর-চাষী ও শোষিত মানুষের তরফ থেকে এইসব অন্যায় ও দুর্দশার বিরুদ্ধে কোন একটা কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করা যায় তাহলে, আমার মতে, আর্থিক দুর্দশা এবং অন্যান্য সঙ্কটের চেয়েও সমাজের মধ্যে নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্কট ও অধঃপতন একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত ক্ষেত্রে এটাই প্রধান সমস্যা — একথা আমি বলছি না। কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলার দিক থেকে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কারণ একটি সঠিক আন্দোলন তো বটেই এমনকী যে কোন একটা কার্যকরী আন্দোলন দৃঢ়চিত্ততা নিয়ে, একটা মনোবল নিয়ে, সাহসের সাথে একটা পরিকল্পনা নিয়ে, আত্মত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে দেশের মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতিগত মানের প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নৈতিক মান ধসে গেলে 'মানুষ মার খেয়েই উঠবে, দাঁড়াবে' — এটা একটা কথার

কথায় পর্যবসিত হয়। এ কখনও ঘটে না। 'সঙ্কট দেখা দিলেই আন্দোলন দানা বাঁধবে' — আমাদের দেশে এরকম সব তত্ত্বও প্রচলিত আছে। আপনারা মনে রাখবেন, তা হয় না। না খেয়ে মরবার মতো অবস্থায় পড়ে বা চরম অভাবের মধ্যে পড়ে মানুষ দুটো পথই গ্রহণ করতে পারে। যদি নৈতিকতার একটা মান থাকে, তাহলে সে যেমন আন্দোলনের রাস্তায় পা বাড়াতে পারে, আবার এই নৈতিক মান না থাকলে সে ভিক্ষুক হতে পারে, ভ্রষ্টাচারী হতে পারে, নীতিহীন হতে পারে, ওয়াগন-ব্রেকার হতে পারে — কিন্তু আন্দোলনকারী হতে পারে না। খেতে না পেলেই, অভাব থাকলেই, মার খেলেই মানুষ লড়াকু হয় — এ কথা সত্য নয়। কাজেই, অভাব হলেই, সঙ্কট দেখা দিলেই দেশের ছাত্র-যুবদের মধ্যে, মজুর-চাষীর মধ্যে একটা কার্যকরী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠবে — আমি এসব তত্ত্বে বিশ্বাসী নই, আমাদের দলও একথা বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এসব জিনিস মানে না। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তত্ত্বেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কোন আস্থা থাকতে পারে না। তাই, আমি এই কথাটার উপর জোর দিতে চাই যে, আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি রেখে যদি সমস্ত সমস্যাগুলোকে বিচার করা যায়, তাহলে নৈতিক অধঃপতনের প্রশ্নটি, সংস্কৃতিগত নিম্নমানের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — যা 'ইটিং ইনটু দ্য ভেরি ভাইটাল্‌স্ অব আওয়ার মর‍্যাল্‌স্' (আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকেই ভিতর থেকে খেয়ে নিচ্ছে) এবং তা রাজনৈতিক 'মর‍্যাল'-এরও (নীতি ও আদর্শেরও) যা 'ভাইটাল' (প্রাণসত্তা), তাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, পিছন থেকে তার সর্বনাশ করে চলেছে।

আন্দোলন গড়ে না তোলার প্রশ্নে সি পি আই (এম)-এর সুবিধাবাদী যুক্তি

তাই দেখুন, সঙ্কট এত তীব্র হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় আজ কোন আন্দোলন গড়ে উঠছে না। সর্ববৃহৎ বামপন্থী দল হিসাবে এখানে আন্দোলন গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব যার ওপর সেই সি পি আই (এম), বিভিন্ন জায়গা থেকে যতটুকু খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বাইরে আন্দোলনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ যতই দিক না কেন, বাস্তবে কোন আন্দোলনের রাস্তাতেই এখন পা বাড়াতে চাইছে না। অথচ দেখুন, এই সি পি আই (এম) যখন সরকারি ক্ষমতায় ছিল, পুলিশ যখন তাদের পিছনে ছিল — আমি ১৯৬৯-৭০ সালের কথা বলছি — তখন তাদের দলের কর্মীদের মধ্যে ছিল ভয়ানক বিপ্লবী ভাব, লড়াকু ভাব, একেবারে 'লড়কে লেঙ্গে' ভাব। সমস্ত কথায় 'বাঁচতে গেলে লড়তে হবে' স্লোগান ছাড়া কোন কিছু তাঁরা বলতেন না। এখন অবশ্য এসব স্লোগান তাঁরা তোলেন না। এখন তাঁরা একটা অদ্ভুত তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, এখন আন্দোলনের সময় নয়। তাঁদের দলের যারা কর্মী বা যুব সম্প্রদায়, যাঁদের ধরা হয় যে আদর্শের জন্যই তাঁরা লড়ছেন, তাঁদের দলে গিয়েছেন — যদি আদর্শের জন্যই দল তাঁরা করে থাকেন, তাহলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে, বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করে লড়বার জন্য, প্রয়োজন হলে মরবার জন্যই তো তাঁরা সংগঠন করতে এসেছেন? অথচ তাঁদের যিনি নেতা, আন্দোলনের মর‍্যাল যিনি দেবেন, তিনি এক মুখে বলছেন, তাঁরা বিপ্লব চান, তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী — যদিও একথাগুলোর তাৎপর্য কী, তা তাঁরা বোঝেন কি না সেসব আলাদা কথা — আবার সেই নেতাই আর এক মুখে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন আন্দোলন হতে পারে না। কারণ তাঁরা বলছেন, এখন আন্দোলন হলে বহু লোকের প্রাণ যাবে, রক্তারক্তি হবে, বহু লোক মারা যাবে। তাহলে তাঁদের কথার মানে তো এটাই দাঁড়ায় যে, তেমন সময়েই আন্দোলন হবে, বা তেমন আন্দোলনই তাঁরা করবেন, যাতে লোকজন কেউ মারা যাবে না, অথবা যদি কেউ মারাও যায়, তাহলে অপরপক্ষই শুধু মারা যাবে, তাঁদের কেউ মরবে না। এরকম একটা পরিস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের মতে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন হতে পারে না। এসব বক্তব্যের সাথে বিপ্লববাদের বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পর্ক কী, তা এইসব বড় বড় নেতারাই ভাল জানেন। আমি এত বড়ও নই, আর বুদ্ধি শুদ্ধি ও আমার এত নেই। আমি এইসব বুঝতেই পারি না।

আমি সোজা কথাটা বুঝি যে, বিপ্লবী আন্দোলন এবং লড়াই যারা গড়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করে, প্রথমে তাদের দিতে হয় বেশি, মরতে হয় বেশি, ত্যাগ করতে হয় বেশি। 'শুধু মারব সেজন্য লড়ব, মারতে না পারলে ভেগে যাব' — এই মনোভাব নিয়ে তারা লড়াই শুরু করতে পারে না। দরকার হলে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই তারা লড়তে আসে। তাদের মনোভাব থাকে, তারা মরবে তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, তবু তারা লড়াই ছাড়বে না। এই মানসিকতার ভিত্তিতেই সব দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জমি তৈরি হয়েছে। এইভাবেই একটি একটি ইঁট গেঁথে বিপ্লবীরা বিপ্লবের ভিত্তি

স্থাপন করেছে, তবে বিপ্লব হয়েছে। আর এখানে সাহসের ভিত্তি বা মূলমন্ত্র হ'ল পুলিশের 'প্রোটেকশন'! পুলিশের প্রোটেকশন ছাড়া তাঁরা লড়াই করতে পারেন না। অথচ বিপ্লব সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁরাই জানেন, পুলিশ তো কোন ছার, বিপ্লবে আসল লড়াই হবে সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনীর সঙ্গে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে। এই প্রবল রাষ্ট্রশক্তির তুলনায় পুলিশ যে কিছুই নয় — এই কাণ্ডজ্ঞানও যাদের নেই, তাদের তো বিপ্লবের কথা চিন্তা করাই চলে না। বিপ্লব হচ্ছে, একটা সংগঠিত, সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের লাগাতার, দীর্ঘস্থায়ী, সচেতন, সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম। যতক্ষণ সশস্ত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি রয়েছে ততক্ষণ শাসকশ্রেণী বিনা লড়াইয়ে এবং বিনা প্রতিরোধে বিপ্লবের রাস্তা ছেড়ে দেবে না। এই তো হ'ল বিপ্লবের 'ভেরি ফান্ডামেন্টাল, এলিমেন্টারি, সিম্প্‌ল্‌' (একেবারে মৌলিক, প্রাথমিক এবং সহজ সরল) কথা। তারপরে তো বিপ্লবের নানা জটিল তত্ত্ব ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রশ্ন।

অথচ তাঁরা যে বলছেন, এখন আন্দোলনের তেমন পরিস্থিতি নেই — ব্যাখ্যা করলে এর মানে তো দাঁড়ায় যে, আগে তাঁদের গভর্নমেন্ট হোক, তখন আন্দোলন হবে। মানে, যেকোন ভাবে হোক, মালিকপক্ষের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে, বর্তমানে গভর্নমেন্টের মধ্যে যে কারণেই হোক, যারা বিক্ষুব্ধ তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে, যদি কোন সময় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবার তাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা গভর্নমেন্টে থাকেন, পুলিশ তাঁদের হাতে থাকে, তাঁরা কিছু করলে তাঁদের জেলে যাওয়ার বা পুলিশের টানা-হেঁচড়া করবার ভয় না থাকে, তখন প্রয়োজন মনে করলে তাঁদের আবার 'বিপ্লবী' হতে কোন অসুবিধা হবে না। যদিও এই প্রয়োজন মনে করার মতো পরিস্থিতি তখন তাঁদের থাকবে কি না, আলাদা কথা। কিন্তু যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে তখনই একমাত্র তাঁরা আবার লড়াই কাকে বলে দেখিয়ে দেবেন। আর, সেই অবস্থা এখন যেহেতু নেই — অর্থাৎ এখন লড়লে যেহেতু রক্তারক্তি হবে, খুনোখুনি হবে এবং এই খুনোখুনিতে তাঁদের মরবে বেশি — কাজেই তাঁদের মতে পরিস্থিতি এখনও লড়বার মতো হয়নি। ফলে, তাঁরা এখন লড়াই করবেন না। সোজা কথা, 'ক্যাট হ্যাজ কাম আউট অব দ্য ব্যাগ' (ঝুলি থেকে সত্য কথাটিই বেরিয়ে এসেছে)। যাঁদের বুদ্ধি আছে, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা আছে, আমি মনে করি, তাঁরা আসল জিনিস ধরতে পারবেন। জ্যোতিবাবু মনে করলেন, তিনি অতি চালাকি করে, অতি ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের মতো খুব একটা কথা বললেন। কিন্তু খবরের কাগজে বক্তৃতা করার ঝোঁকে এই যে কথাটা তিনি বললেন, এই একটা কথার দ্বারাই যাঁদের বোঝবার তাঁদের তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দলটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিয়ে যা-ই কিছু বলুক না কেন, তাঁরা আসলে কেমন বিপ্লবী এবং কেমন ধরনের বিপ্লব তাঁরা করবেন।

বুর্জোয়ারা নানা কৌশল অবলম্বন করে অত্যাচার চালিয়ে বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে

তাহলে, এই হচ্ছে বামপন্থী দল ও শক্তিগুলোর মধ্যে — আমাদের কথা যদি বাদ দেওয়া হয় — আর যারা সরকারি মহলগুলোতে, 'ইনটেলিজেন্স' বিভাগে প্রতিপক্ষ বা বিরোধী দল হিসাবে বিবেচিত — তাদের আসল চেহারা। আমরা তুলনামূলকভাবে এখনও সি পি আই (এম)-এর চাইতে ছোট দল বলে আমাদের শক্তিটাকে ওরা গণনার মধ্যে বেশি করে আনে না। কিন্তু গণনার মধ্যে বেশি করে না আনলেও, মনে রাখবেন, আমাদের সমস্ত গতিবিধি, কর্মধারা এবং শক্তিবৃদ্ধিকে তারা অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে ও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে। কারণ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে তারাও শিক্ষা নিয়েছে। আগে বুর্জোয়াদের মনোভাব ছিল, ছোট দল যদি বিপজ্জনক হয়, তাহলে তাকে ঘাঁটিয়ে খানিকটা তার প্রচার করে দিও না — শুধু 'কিছু নয়, কিছু নয়' করে তাকে এড়িয়ে যাও, পাশ কাটিয়ে যাও। কারণ তারা ভাল করেই জানে, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, এমনকী বিরুদ্ধতা করতে গেলেও উল্‌টো দিক থেকে তার খানিকটা প্রচার হয়ে যায়, সে সামনে এসে যায়। কাজেই, তেমন দল হলে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু 'ইগ্‌নোর' করে তাকে মুছে দেওয়া, 'কিছু না, কিছু না' করে একদম মুছে দেওয়াই ছিল তাদের মনোভাব। দল ছোট হলেও যাদের বিপ্লবী বলেই তারা বিপজ্জনক মনে করে, তাদের সম্পর্কে এরকম একটা কৌশল চিরকালই বুর্জোয়ারা নিয়ে থাকে। আবার, আপনারা মনে রাখবেন, অনেক ছোট দলকেও মাথায় হাত বুলিয়ে তারা খুব বড় করে দেয়, যখন মনে করে সেই সমস্ত ছোট দলকে কাজে লাগিয়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। কিন্তু বিপজ্জনক ছোট দলকে তারা সাধারণত ইগ্‌নোর করেই মুছে দিতে চায়। কিন্তু ইতিহাস আর একটা শিক্ষাও তাদের দিয়েছে। তারা দেখেছে যে, এভাবে ইগ্‌নোর করে বিপ্লবী শক্তিকে খতম করা যায় না — তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটেই। আর, যখন আপন শক্তিতে সে বেড়ে যায়,

তখন সে বিপদ সৃষ্টি করে। বহু দেশের ঘটনা থেকে তারা এটা লক্ষ্য করেছে। যাদের তারা প্রথমে তুচ্ছ করে দেখেছিল, ভেবেছিল — তাদের কী-ই বা লোকজন আছে, কিছুই ওরা করতে পারবে না, ওদের কিছু নেই, শুধু বড় বড় কথা বলছে, দেখা গেল, পার্টির তত্ত্বটি সঠিক বলে, রাজনৈতিক লাইন সঠিক বলে, অর্থাৎ তারা সত্যি কথা বলছে বলে এবং মানুষের যা যথার্থ প্রয়োজন সেই সত্য রাস্তাটি নির্দেশ দেবার ক্ষমতা রাখে এবং দেখাতে পারে বলে, শুধু এইটিকে আধার করে অর্থাৎ আদর্শ এবং সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে আধার করে সেই ক্ষুদ্র শক্তিই, বুর্জোয়ারা ইগ্‌নোর করা সত্ত্বেও, দেখতে দেখতে বিরাট আকার ধারণ করে, যখন তাকে আর রোখা যায় না। ইতিহাস থেকে বুর্জোয়ারা এই শিক্ষাটাও নিয়েছে।

ফলে, এখন তারা খানিকটা সতর্ক হয়েছে। তাই যাদের তারা বিপজ্জনক শক্তি বলে মনে করে — অর্থাৎ তাদের ভাষায় যারা 'এক্সট্রিমিস্ট' (চরমপন্থী) বা 'ডেঞ্জারাস' (বিপজ্জনক), মানে বিপ্লবী দল — যাদের নিয়ে তাদের ভয় এবং আতঙ্কের কারণ রয়েছে, ক্ষুদ্র হলেও তাদের আর আগের মতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না, বা 'কিছুই দেখছি না' — এরকম করে না। হয়তো আগ বাড়িয়ে তাদের প্রচার করে দেয় না এবং তাদের 'ইমপর্টান্স' (গুরুত্ব) বাড়িয়ে দেয় না, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে খুব নজর রাখে। খুব 'ক্রিটিক্যালি' (তীক্ষ্ণভাবে) তাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে তারা 'ওয়াচ' (লক্ষ্য) করে এবং উপর থেকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারের গুরুত্ব না দিয়েও সুযোগ পেলেই পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা, নানা 'মেসিনারি'র দ্বারা তাদের 'হ্যারাস' করে এবং তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে চালিয়ে তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তাদের এই কায়দাটি আমরা খুব হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি এবং আমরা এটা ধরতে পেরেছি। বিপ্লবীদের চেয়ে ওরা নিজেদের বেশি বুদ্ধিমান ভাবে ঠিকই, কিন্তু বিপ্লবীরা কাজ করে বিজ্ঞান নিয়ে, আর ওরা কাজ করে ওদের 'ফ্যান্সিফুল থিয়োরি' (মনগড়া ধারণা) নিয়ে। ফলে, এই জায়গায় পার্থক্যটা বিরাট দাঁড়িয়ে যায়। ওরা যেটাকে অত্যন্ত কূটবুদ্ধি বলে মনে করে, বিজ্ঞানের আলোকে বিপ্লবীদের কাছে সেগুলো জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সেই কূটবুদ্ধিগুলো বিপ্লবীদের কাছে ধরা পড়ে যায়। ফলে, আমরা ধরতে পারি। কিন্তু শুধু ধরতে পারাটাই তো বড় কথা নয়। ধরতে পেরে তাকে 'গার্ড' করবার মতো উপযুক্ত যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, তা আমরা করতে পারি কি না এবং সেগুলিকে কার্যকরী করার মতো শক্তি আমরা সময় থাকতে অর্জন করতে পারি কি না, সেইটাই হচ্ছে আসল কথা। এটা না পারলে, শুধু আদর্শটা আমাদের ঠিক বলেই আমরা জিতে যাব — এরকম চিন্তা করলে ভুল হবে। আদর্শকে রূপায়িত করবার মতো প্রয়োজনীয় শক্তিসমাবেশের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি আমরা দ্রুত গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে মুশকিল হবে।

চূড়ান্ত নীতিহীনতা বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেও বিষকীটের মতো ঢুকে গিয়েছে

যাই হোক, যে কথাটা বলতে বলতে আমি এই জায়গায় এসে গেলাম, তা হচ্ছে, আমাদের বাদ দিলে এই হ'ল অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর, বিশেষ করে, সি পি আই (এম) এবং তাদের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর আসল চেহারা — যারা খুব উগ্র এবং মহাবিপ্লবী বলে এই সেদিন পর্যন্তও ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল এবং আপনারা মনে রাখবেন, যেখানে এস ইউ সি আই নেই সেসব জায়গায় তাদের সম্পর্কে আজও এইরকম একটা বিরাট বিভ্রান্তি রয়েছে। একথা যদি আপনারা ধরে নেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ বুঝে ফেলেছে, এইসব দলগুলো কিছু করবে না বা এরা সত্যি সেরকম কিছু নয় — তাহলে অত্যন্ত ভুল হবে। স্তরে স্তরে মানুষের মধ্যে এইসব বামপন্থীদের সম্পর্কে বা সাধারণভাবে বামপন্থা সম্পর্কেই নানা রকমের বিভ্রান্তি রয়েছে। এই সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যে আবার একটা সাধারণ জিনিস, যেটা মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই রয়েছে, সেটা হচ্ছে, সি পি আই(এম) আর যাই হোক্ একটা বামপন্থী দল, একটা কংগ্রেস বিরোধী — ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী দল। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে যেখানে ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী বা কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে সি পি আই(এম)-এর বেশি শক্তি থাকার জন্য বিকল্প হিসাবে তার দিকেই জনসাধারণ ঝুঁকছে, 'স্যুইং' করছে। অথচ এইরকম যে একটা পার্টি, যে পার্টিটার পেছনে বেশিরভাগ বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের 'মর‍্যাল' এবং 'ইমোশন্যাল' সমর্থন রয়েছে, সেই পার্টির নিজের মর‍্যাল-টা একবার দেখুন। আবার, এই পার্টিটা যে কখনও লড়ে না, বা নানা সময়ে নানা লড়াইতে আসে না — একথাও সত্য নয়। তারা শ্রমিক-চাষীর আন্দোলনের মধ্যে মিলেগুলে আছে, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রামও তারা কখনও কখনও পরিচালনা করে। অথচ

সেই পার্টি সম্বন্ধে একটু আগের আলোচনাতেই দেখলেন, তাদের লড়াই করবার সাহস এবং চরিত্রের যে বুনিয়াদ সেইটা গত যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে কীভাবে ধসে গিয়েছে। পুলিশ পিছনে না থাকলে এখন আর আন্দোলনের কথা ভাবতেই পারে না। সাধারণ অর্থে তাদের 'মিলিট্যান্ট ক্যাডার' (জঙ্গি কর্মী-টর্মী) সবই তো রয়েছে।

তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, তাদের যে সাহস, সে সাহস হচ্ছে আসলে পুলিশ এবং গভর্নমেন্টের সমর্থনপুষ্ট — সেইটা পিছনে থাকলে তবে তাদের বিপ্লবীপনা, তবে তাদের লড়াই করবার শক্তি। এই জিনিস তারা এখন শিখেছে। এর অর্থ হচ্ছে, পঁচিশ বছর আগেও, এমনকী পনের বছর আগেও, ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনের হাজার ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও — যারা আমাদের মতো সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল নয়, সেই সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর মধ্যেও বা তাদের চেয়েও যারা আরও 'মডারেট' তেমন ধরনের বামপন্থীদের মধ্যেও লড়াই করার যে দৃঢ়তাটুকু ছিল, চরিত্রের যে জোর ছিল, তাদের ক্যাডারদের যে সাহস ছিল এবং পুলিশকে মোকাবিলা করবার, অত্যাচারকে মোকাবিলা করবার, এমনকী দরকার হলে জেলে যেতে এবং মরতে প্রস্তুত — এইরকমের যে মানসিকতাটি ছিল, সেটি আজ উবে গিয়েছে। আর এটি উবে গিয়েছে কোন্ স্তর পর্যন্ত? শুধু মডারেট যারা তাদের স্তরেই নয়, সি পি আই(এম)-এর 'র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল'-এর পর্যন্ত উবে গিয়েছে। তাহলে এটা কীসের পরিণতি? এ জিনিস কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে, সমাজের স্তরে স্তরে নীতিনৈতিকতা ও আদর্শবাদের ভিত নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে গোটা দেশের ছাত্রসমাজ ও যুবসম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল — সকলেরই জন্মজয়ন্তী, মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। এসবের মানে তারা বোঝে কি না, আমি জানি না। মাস্টারমশাইরাও এসবের উপর বক্তৃতা করেন — তাঁরাই বা এসবের কী মানে বোঝেন, আমি জানি না। কারণ, একটা কথা আমার এরই সঙ্গে মনে হয়; যাঁরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলকে এতটুকু বুঝেছেন — আমাদের মতো বুঝুন না বুঝুন — বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম, নেতাজি সুভাষ প্রমুখ মনীষীদের এতটুকু বুঝেছেন, তাঁরা তো একটা কথা বুঝবেন যে সমাজের মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার শক্তি ব্যক্তি হিসাবে যদি আমার মধ্যে না থাকে, তাহলে আমি মানুষ নামেরই যোগ্য নই। অন্তত এইটুকু নৈতিক মান তো মানুষের মধ্যে আগে গড়ে উঠবে, তারপরে তো তার ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতার প্রশ্ন। কারণ কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় — এ ঠিকমতো বিচার করতে পারা একটা জটিল বিষয়, জ্ঞানের বিষয়, শিক্ষার বিষয়। কিন্তু আমি যেটাকে অন্যায় বলে মনে করি, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সাহস যদি আমার না থাকে এই ভয়ে যে, পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, বা আমার চাকরিটা চলে যাবে, অথবা আমি নিজে যদি একটা অন্যায় করি এবং সেটা করতে আমার এতটুকু বিবেকে না লাগে, তাহলে তো আমি মানুষই নই। অথচ যারা মনুষ্যত্বের এই ধারণা নিয়ে আজ চলতে চায়, লক্ষ্য করলে দেখবেন, তাকে তার বাবা-মা পর্যন্ত বোকা বলে। যে ছেলে মিথ্যাচার করতে গররাজি হয়, ঘুষ দিতে এবং নিতে না পারে, যেকোনও অন্যায় করে নিজের কেরিয়ারটি গড়ে তুলতে না পারে, তাকে মানুষ মনে করে বোকা। শুধু বাইরের লোক মনে করে তা নয়, যে পিতা তাকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি নিজেও মনে করেন — 'ও বোকা'। মনে করেন — 'ও তেল দিয়ে বড় হতে পারত, কিন্তু তেল দেয়নি। মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিয়ে বড় হতে পারত, কিন্তু বিকোয়নি। কারণ ও একটি বোকা। আর আমি খুব চালাক, আমি বিকিয়েছি।' আবার সেই বাবা-মা-ই বাড়িতে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রাখে। সমাজ এই জায়গায় এসে গেছে। পরাধীনতার যুগেও কিন্তু মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ, ধর্মবুদ্ধি, নীতি-নৈতিকতার ধারণা সমাজে এবং পরিবারের স্তরে স্তরে এতটা ধসে যায়নি — আমার এই কথাটা ভুলবেন না। ইংরেজের বিরুদ্ধে এদেশে লড়াই যখন তেমন আকারেও হয়নি, তখনও কিন্তু সমাজজীবনে নীতি-নৈতিকতার একটা মান ছিল, যেটা মানুষ মেনে চলত। এখন নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির এই ভিতটা নেই। আর এটা নেই বলে এই নীতি-নৈতিকতার আঁচ ও প্রভাবের বাইরে থেকে যেসব রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শের কথা বলছে এবং একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দিতে চাইছে, সেইসব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও চূড়ান্ত নীতিহীনতা বিষকীটের মতো, পোকার মতো ঢুকে গিয়েছে।

তাই বহুদিন আগে, ১৯৬৬ সালে — তখনও বামপন্থীরা পশ্চিমবাংলায় সরকারে যায়নি — এই ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে-ই আমি একটা কথা বলেছিলাম। আমার সেই কথা শুনে সেদিন অন্যান্য সমস্ত বামপন্থী দলের নেতারাই খুব চটে গিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, বামপন্থী দলগুলো কংগ্রেসের দুর্নীতি নিয়ে

বক্তৃতা করছে, ঠিকই করছে — এ নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই;কারণ ক্ষমতা পাওয়ার পর কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্রই তাই হয়ে গিয়েছিল; যেহেতু কংগ্রেস পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করার চেষ্টা করেছে, সেজন্য আজকের যুগে এটাই তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি — এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমাদের — যাদের বিকল্প নেতৃত্ব, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দেওয়ার কথা — সেই 'র‍্যাডিক্যাল ফোর্স' আমরা, অন্যেরা, সকলে মিলে হয় সেদিন রাস্তা নির্ণয় করতে ভুল করেছি, না হয় নিজেরা কোন্দল করেছি, না হয় সেই সময়ে আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ছোট ছোট 'পকেট' (এলাকাভিত্তিক) কাজকে কেন্দ্র করে যে 'সার্কেল মাইন্ডেড্‌নেস্' (গোষ্ঠী মানসিকতা) গড়ে উঠেছিল, তার জন্য 'সেক্‌টেরিয়ান' (সঙ্কীর্ণ) দলীয় স্বার্থে নিজেদের মধ্যে আমরা লাঠালাঠি, রেষারেষি করেছি। এইসব নানা কারণে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই বিকল্প নেতৃত্বটা দিতে পারিনি। ফলে, সংগ্রাম করেছি আমরা, করেছে জনসাধারণ — নেতৃত্বটা পয়সাওয়ালা লোকদের এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিভূ কংগ্রেসের হাতে চলে গিয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভূরাই দেশের নেতা হিসাবে সেদিন উপস্থিত হয়েছে। বামপন্থীদের মধ্যেও যে সেদিন দু'একজন নেতা হয়নি তা নয়। কিন্তু খবরের কাগজগুলোর কল্যাণে, বিদেশি শাসকদের প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে, বুর্জোয়া নেতাদের নিজেদের ব্যবহারের কায়দা-কানুন-কৌশলের কল্যাণে পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভূরাই জনমানসের সামনে সেদিন দেবতা হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। জনসাধারণ তাদের সম্পর্কে পরম বিশ্বাসে ভেবেছে যে, এরা খুব ভাল মানুষ। ভেবেছে, এরা যখন স্বাধীনতার জন্য সমস্ত কিছু করছে, তখন আমাদেরও অনেক কিছু করে দেবে। মাত্র অল্প কিছু লোকই সেদিন ধরতে পেরেছিল যে — না, এরা কিছু করবে না, এরা পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক এজেন্ট, এরা গোটা দেশটাকে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কোরবানির সমস্ত ফলটাকে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকে সুসংহত করার কাজে ব্যবহার করবে। কিন্তু ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে এই উপলব্ধিকে সেদিন নিয়ে যাওয়া যায়নি। এমনকী বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশের মধ্যেও এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি। বিশাল ভারতবর্ষের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই সেদিন সীমিত ছিল। ফলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভূরাই শাসন ক্ষমতায় এসেছে এবং এসে বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর সীমার মধ্যে তাদের যা করবার তাই তারা করেছে।

সঠিক পথ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সদিচ্ছা ও সততার দ্বারাই কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না

যদিও এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। তা হচ্ছে, এই বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যেও এমন কিছু কিছু লোক সেদিন ছিলেন যাঁদের মধ্যে, তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ যাই হোক, সততার একটা ভিত্তি ছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ ছিল। শ্রেণীসংঘর্ষ বা শ্রেণীসংগ্রামের কথা যদি না তোলা যায়, তাহলে তাঁদের অর্থে যা জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধ, তার ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে দেশসেবা ও দেশগঠনের স্বপ্ন ছিল। তাঁরা তাঁদের মতো করে দেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে তো ছিল তাঁদের স্বপ্নবিলাস। কারণ তাঁরা চেয়েছেন দেশকে গঠন করতে, কিন্তু কোন্ রাস্তায় সত্যিকারের দেশ গঠন সম্ভব, সেটা বিচার করার দরকার মনে করেননি। ভেবেছেন, তাঁরা যখন চাইছেন দেশের মঙ্গল, তখন মাথা থেকে একটা পরিকল্পনা বের করলেই তাঁরা দেশের মঙ্গল করতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেননি, তা হয় না। এটা কারোর কিছু করতে চাওয়ার উপরেই শুধু নির্ভর করে না। কোন কিছু হওয়ার এটা রাস্তা, একথা বিজ্ঞান বলে না। বিজ্ঞান বলে, প্রতিটি জিনিস যে ঘটে, তা সবই 'ল গভার্নড্ ফেনোমেনন' (নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত), প্রতিটি ক্রিয়াই 'কজালিটি' (কার্যকারণ সম্বন্ধের) নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ম শুধু 'ন্যাচারাল সায়েন্সে'র (প্রকৃতিবিজ্ঞানের) ক্ষেত্রেই রয়েছে তাই নয়, আজ বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার আহরিত তত্ত্বগুলোকে 'কো-অর্ডিনেট' (সংযোজিত) করলে যে সত্যটি পাওয়া যাচ্ছে, তা হ'ল, সমস্ত ক্ষেত্রেই, এমনকী যে বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে একজন কিছুই জানেন না, সেক্ষেত্রেও ক্রিয়ার এটাই রীতি। না জানা থাকলে তাঁর কাজ হচ্ছে সেটা জেনে নেওয়া। ফলে, কোন একটা 'প্ল্যানে'র (পরিকল্পনার)ক্ষেত্রে, 'প্রোগ্রামে'র (কর্মসূচির) ক্ষেত্রে, মানসিকতার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, আদর্শের ক্ষেত্রে কেউ যদি একটা জিনিস উচিত বলে মনে করেন এবং ভাবেন যে, তিনি যখন চাইছেন, তখন সেটা করতে পারবেন না কেন, তাহলে তাঁর মনে রাখা দরকার যে, তিনি চাইলেই বা মনে করলেই তা করতে পারেন না। কারণ আমি আগেই বলেছি, সব জিনিসেরই

হওয়ার একটা রীতি আছে, নিয়ম আছে, কারোর পক্ষেই সেই নিয়মকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনারা মনে রাখবেন, এই নিয়মের সীমা মেনে চলাই হ'ল আমাদের বুদ্ধি বা আমাদের জ্ঞানের চৌকসতা এবং আমাদের সংযম। নিয়মকে অস্বীকার করতে গেলে আমরা ব্যবহারিক জীবনে যেমন অসংযমী হই, জ্ঞানের জগতেও তেমনি আমরা 'ইউটোপিয়া'-র শিকার হই।

ফলে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা কল্পনাবিলাসী ছিলেন, যাঁরা সাধারণ মানুষের কথা হয়তো নিজেদের মতন করে কিছু কিছু ভেবেছেন, জনসাধারণের জন্য ব্যক্তিগত দিক থেকে যাঁদের মনটা সত্যিই কেঁদেছে, তাঁরাও কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত এই পথটি অনুসরণ না করার ফলে আসলে পুঁজিপতিদেরই সেবা করেছেন। কারণ তাঁদের রাস্তাটা ভুল ছিল। তাঁদের অনুসৃত রাস্তাটা যে পুঁজিবাদকেই গড়ে তুলবে — এটা তাঁরা বিচার করে দেখতেই চাননি। এমনকী, যাঁরা এটা দেখাতে গিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কেও তাঁরা সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে পারেননি। ভেবেছেন — তাঁরা সৎ, তাঁরা এত ত্যাগ করেছেন, তাঁরা জনগণের মঙ্গল করতেই চান, তাহলে তাঁরা পুঁজিবাদের দালালি করছেন বলে যে কথাটা বলা হচ্ছে — এ কি কখনও সম্ভব? তাঁদের কি জনগণের জন্য মন কাঁদে না? কিন্তু তাঁরা যা চান তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো সবই যে 'ইম্‌মেটেরিয়াল' (অপ্রাসঙ্গিক) এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, একজন মানুষ যত সৎ-ই হোন না কেন, শুধু সততাকে সম্বল করেই তিনি যা চান, তিনি তা করতে পারেন না। সৎ, অসৎ-এর প্রশ্নটা কোন কিছু করার ব্যাপারে একটা মূল বিচার্য বিষয় ঠিকই। কারণ কোন লোক — যার 'স্ক্রুপ্‌ল্‌' নেই, যার 'ডিটারমিনেশন' (দৃঢ়চিত্ততা) নেই, যার সততা নেই — সে কোন কিছু করতে পারে না। ফলে, এটা তো একটা 'এ বি সি কন্ডিশন' (প্রাথমিক শর্ত) যে, যে কিছু করতে চায়, সততা তার চাই, দৃঢ়চিত্ততা তার চাই, কোন কিছু করবার 'ড্রিম' (স্বপ্ন) তার থাকা চাই। এ জিনিসটা চাই-ই। কিন্তু এগুলো থাকলেই কি শুধু তার দ্বারা তিনি যা চান, তাই করতে পারেন? না, এগুলো থাকলেও তিনি তাঁর সমস্ত সৃজনীশক্তিকে বিপথগামী করে দিতে পারেন, ধ্বংস করে দিতে পারেন — যদি তিনি ভুল রাস্তা গ্রহণ করেন। তাহলে, রাস্তা ঠিক করাটা কোন কিছু করবার ব্যাপারে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রতিটি জিনিস ঘটার পিছনে যেমন একটা নিয়ম আছে, কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ তা 'ল গভার্নড' (নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত), তেমনি সমাজবিকাশেরও একটা নিয়ম আছে। এই নিয়মটি অনুধাবন না করে যদি কেউ ভাবেন যে, তাঁর যখন সততা আছে, উপোস করবার ক্ষমতা আছে, না খেয়ে মরে যাওয়ার ক্ষমতা আছে, এমনকী আত্মাহুতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, যখন জনগণের জন্য তিনি সব দিতে পারেন, তখন তিনি যেমন চান তেমনভাবেই সমাজটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারবেন, চাই তো আবার তাকে আশ্রমের যুগে নিয়ে যেতে পারবেন, চতুর্বর্ণের যুগে নিয়ে যেতে পারবেন, বা তাঁর মনগড়া ফর্মূলার দ্বারা যেমনটি চান তেমনটি করে দিতে পারবেন — তাহলে তাঁর জানা দরকার যে এমনটি হলে হয়তো ছিল ভাল, কিন্তু হয় না, হওয়ার উপায় নেই। এ হওয়ার নয়। ফলে, বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁদের সততাও ছিল, তাঁরাও সঠিক রাস্তাটি নির্ণয় করতে পারেননি বলে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টার বিনিময়ে পুঁজিবাদই সংহত হয়েছে।

বামপন্থীরা ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই দুর্নীতিপরায়ণ

যাই হোক, এ তো গেল কংগ্রেসের কথা। কিন্তু যে কথার থেকে আমি এই আলোচনা শুরু করেছিলাম, তা হচ্ছে, সেদিন বামপন্থীদের উদ্দেশ্য করে আমি বলেছিলাম, তাঁরা কংগ্রেসের দুর্নীতি সম্পর্কে বলছেন — বলছেন, কংগ্রেসের সমস্ত লোক দুর্নীতিপরায়ণ, কংগ্রেস দুর্নীতির চর্চা করছে, চুরি করছে, জোচ্চুরি করছে, ঠকাচ্ছে, তাদের মধ্যে কোন সৎ লোক নেই, তারা সব পচা ডিম হয়ে গেছে — এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু কংগ্রেস তো ক্ষমতায় গিয়ে পচে গেছে, দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছে। তার আগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তারা লড়েছে, কংগ্রেসের কর্মীরাও লড়েছে। সেই সময় আমরাও সব কংগ্রেসই ছিলাম। এই কংগ্রেসের কর্মীরা, গান্ধীবাদী কর্মীরা তখন অনেক আত্মত্যাগ করেছে, তখন তাদের ত্যাগ করবার ক্ষমতা ছিল। এখন ক্ষমতা পাওয়ার পর তারা সব বোঁচকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বামপন্থীদের আমি সেই '৬৬ সালে বলেছিলাম যে, তাঁরা কি আয়নায় নিজেদের মুখ দেখেছেন? তাঁরা তো তখনও ক্ষমতায় যাননি। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কি, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই তাঁদের ঘরের মধ্যে হু হু করে বানের জলের মত দুর্নীতি ঢুকে বসে আছে? তাঁরা তো তখনই দুর্নীতিপরায়ণ। তাহলে তাঁদের নিজেদের ঘরে যে দুর্নীতি ঢুকেছে, আমি বলেছিলাম, তার বিরুদ্ধে লড়াই করুন। বলেছিলাম,

ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতা পেলে তাঁরা কী করবেন? তাঁরা তো সর্বনাশ করে ছাড়বেন। বামপন্থার ঝান্ডা উড়িয়েই তো তাঁরা গোটা দেশকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাবেন। আমার একথা শুনে বামপন্থী নেতারা খেপে গেলেন। নানান ঘটনা থেকে আমি সেদিন এই যে কথাটা বলেছিলাম, সেই ইতিহাসের মধ্যে এখন আর যেতে চাই না। আমি বলেছিলাম, বামপন্থী আন্দোলন একটা বাস্তুঘুঘুর আড্ডা হয়েছে। তাঁরা বলেন একটা, করেন আর একটা। তাঁদের মধ্যে কোন রকমের স্ক্রুপ্‌ল্ নেই। এমনকী 'ওয়ার্ড অব অনার' (কথার দাম) বলে বুর্জোয়া রাজনীতির যে একটা সাধারণ রীতি ছিল, সেই জিনিসটুকুরও কোন মূল্য তাঁরা দেন না। যদি কেউ তাঁদের প্রশ্ন করে — 'আপনারা বলেছিলেন এইরকম, এখন আর একরকম করছেন কেন?' সঙ্গে সঙ্গে নির্বিকারচিত্তে তাঁরা হেসে উত্তর দেন — 'ও বলেছিলাম নাকি? তা বলেছিলাম তো কী হয়েছে। এইরকম হয়েই থাকে।' অথবা সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের তত্ত্বকথা আউড়ে বলে দেন, 'সত্য তো পরিবর্তনশীল। বলেছিলাম বলেই যে বিপ্লবের প্রয়োজনে কথাটা রাখতে হবে, তার কী মানে আছে?' অর্থাৎ তাঁদের ব্যাপারটা অনেকটা 'আর্ষ প্রয়োগে'র মতন — যখন যা বলেন, সেটাই ঠিক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে তাঁরা সুবিধা অনুযায়ী অন্তত এইটুকু বুঝেছেন যে, যেহেতু ভগবান নেই, ধর্মীয় অর্থে পাপ-পুণ্যের বালাই নেই, নরকবাসের বালাই নেই — সুতরাং ভয় কী? ফলে, তাঁদের হচ্ছে, যখন যেমন তখন তেমন — অর্থাৎ তাঁদের নীতিরও কোন বালাই নেই।

একমাত্র এস ইউ সি আই-ই রাজনৈতিক আন্দোলনে নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সুরটি দেওয়ার চেষ্টা করছে

এখন এই যে সমাজের অধঃপতিত নীতি-নৈতিকতার প্রভাব বামপন্থী আন্দোলনের ভেতরটা খেয়ে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে বামপন্থী আন্দোলনকে একটা উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য, মনে রাখবেন, একমাত্র আমাদের দল এস ইউ সি আই-ই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। এটা ঠিক, আমরা যা নই, তা যদি আমরা দাবি করি, তাহলে ভুল হবে। কিন্তু একথা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি যে, এই একটি মাত্র দলই, তার ছাত্র সংগঠন এবং তার অন্যান্য গণসংগঠনগুলো অন্তত এই জিনিসটা ধরবার চেষ্টা করছে যে, শুধু স্লোগান দিয়ে, শুধু চাল নেই, ডাল নেই বলে মানুষগুলোকে খেপানো যেতে পারে, কিন্তু সমাজের মধ্যেই যদি সেই আন্দোলনের পরিপূরক একটা নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি গড়ে তোলা না যায় — অন্তত যাঁরা আন্দোলনটা গড়ে তুলতে চাইছেন, তাঁদের মধ্যেও যদি সেটা না থাকে, তাহলে সমস্ত আন্দোলনটাই একটা 'প্রিভিলেজে' পরিণত হয়, লড়াইয়ের হাতিয়ার হওয়ার বদলে তা সুবিধায় পর্যবসিত হয়। যদিও একথাও আমি জানি যে, এইগুলোকে লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য আন্দোলনের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিটা রাখবার চেষ্টা করতে থাকলেই দলের প্রতিটি নেতা ও কর্মীর আচরণের মধ্যে সেই নীতি-নৈতিকতার মানটি একেবারে সবসময় জ্বলজ্বল করবে — এটা হয় না, এটা অবাস্তব। ফলে, এমন ইউটোপিয়া আমার নেই। কিন্তু যেটা কার্যকরী কথা কমরেডস্, সেটা হচ্ছে, আন্দোলনের মধ্যে এই নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিটি গড়ে তোলবার জন্য একটা জীবন্ত ও মরণপণ সংগ্রাম একটি দল পরিচালনা করছে কি না, এইটা লক্ষ্য করা দরকার। দেখা দরকার, সেই দলটি যখন একটা রাজনৈতিক লড়াই শুরু করেছে, যখন সে শোষণ অবসানের জন্য স্লোগান তুলছে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছে, তখন সেই লড়াই এবং আন্দোলনের মধ্যে নেতা ও কর্মীদের নীতি-নৈতিকতার মান এবং জনতার মধ্যে রুচি-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতার মান ঠিক রাখার জন্য আন্দোলনের প্রক্রিয়া, স্লোগান ও বক্তব্যের মধ্যে 'কালচারাল টিউন'টি (সংস্কৃতির সুরটি) সে ঠিক ঠিক দেওয়ার চেষ্টা করছে কি না এবং এই সংগ্রামটি তার 'রিয়েল' (যথার্থ) কি না এবং ঠিক কি না। এইটা ঠিক হলে মনে রাখবেন, একদিন সেই দলই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতা গড়ে তোলার এই সংগ্রাম যদি সে ঠিক মতো চালাতে থাকে, তাহলে আজ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি তার থেকেও যায়, যেটা সে চেষ্টা করেও দূর করতে পারছে না, তা সত্ত্বেও যেহেতু এই সংগ্রামটা তার জীবন্ত এবং একটা সঠিক উদ্দেশ্য ও সঠিক লাইনের ভিত্তিতে সে সংগ্রামটা চালাচ্ছে, সেহেতু অসুবিধাগুলো সে একদিন কাটিয়ে উঠবেই এবং শেষপর্যন্ত বিপ্লবের একটা 'বুলওয়ার্ক' (দুর্গ) হিসাবে এদেশে গড়ে উঠবে। একমাত্র এস ইউ সি আই-ই এই দেশে এইটা করবার চেষ্টা করছে। শুধু কতকগুলো স্লোগান দেওয়া বা রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করাই নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনে নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সুরটি দেওয়ার সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

উন্নত নীতি-নৈতিকতা ব্যতিরেকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না

এতক্ষণ আলোচনা করে আমি এইটাই আপনাদের দেখালাম যে, শুধু স্লোগান দিয়ে বা মানুষগুলো না খেয়ে রয়েছে বলে তাদের খেপিয়ে দিলেই বিপ্লব করা যায় না এবং বিপ্লবের সংঘশক্তি এবং মানসিকতা গড়ে তোলা যায় না। যদি যেত, তাহলে এর প্রয়োজন ছিল না। আমি দেখাতে চেয়েছি, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও সমাজজীবনে যতটুকু নীতি-নৈতিকতার মান ছিল, তা কীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারপরে '৬৭ সালে বামপন্থীরা ক্ষমতা পাওয়ার পর, এমনকী সি পি আই(এম)-এর মতন বিপ্লবী বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করেন, তাঁদের র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের মধ্যে সেই সাহস, মনোবল, শক্তি, নীতি-নৈতিকতা সমস্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে — যার ফলে, কেন তাঁরা আন্দোলন করতে পারছেন না, সে সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন। আসলে তাঁরা পারছেন না এই কারণেই যে শুধু লড়াইয়ের স্লোগানগুলো তুলে মানুষগুলোকে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে দিলেই আপনা-আপনি 'অটোমেটিক' (স্বতঃস্ফূর্ত) প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী চরিত্র গড়ে উঠবে — এরকম একটা তত্ত্বে, তাঁরা বলুন বা না বলুন, হয় তাঁরা বিশ্বাসী, অথবা তাঁরা এই 'ফেনোমেনন'টিকে (বিষয়টিকে) ধরতেই পারেননি যে গোটা সমাজজীবনে 'কালচারাল ডিগ্রেডেশন' (সাংস্কৃতিক অধঃপতন) যদি ব্যাপক আকারে ঘটে এবং বিপ্লবী আন্দোলন তার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক মানকে যদি তোলবার চেষ্টা না করে, তাহলে বিপ্লব গড়েই উঠতে পারে না। বিপ্লবের সমস্ত আয়োজনের সঙ্গে বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতির দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মানসিক প্রস্তুতির বিষয়টি সংস্কৃতির সঙ্গে নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। লেনিন বলেছেন, 'কালচারাল রেভোলিউশন প্রিসিড্স্ টেকনিক্যাল রেভোলিউশন' — অর্থাৎ সব বিপ্লব গড়ে তোলবার আগে বিপ্লবের উপযোগী মানসিক কাঠামো, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলা দরকার। তার জন্য একটা 'পেইন্স্টেকিং ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগ্ল্' (কষ্টসাধ্য আদর্শগত সংগ্রাম) একেবারে 'কালচারাল লেভেল' (সংস্কৃতির স্তর) পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে গড়ে তুলতে হবে — যেটা রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্কৃতির সুরটাকে গড়ে তুলবে। 'ডাইরেক্টলি' (সরাসরি) একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন যদি না-ও হয় — কারণ এটা কখন কীভাবে করতে হবে এবং কতগুলি 'উইং'-এ (শাখায়) হবে, এগুলো তার 'ডিটেইল্স্' (পুঙ্খানুপুঙ্খ) আলোচনার বিষয় — কিন্তু এই আদর্শগত সংগ্রামটা গড়ে তুলতে হবে। এটাকে অবহেলা করে, 'বিপ্লব করব' এই ভাবনাটা আছে বলেই শুধু সেইটাকে সম্বল করে যদি কেউ বিপ্লব করতে যান, তাহলে একদিন তাঁর এই ফাঁকি ধরা পড়বেই এবং সেই ফাঁকির শিকার তিনি নিজেই বনে যাবেন। তার ফলে একদিন যে চারিত্রিক সম্পদের অধিকারী তিনি ছিলেন, লড়বার যে ক্ষমতা তাঁর ছিল, সেগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যার মধ্যে নীতি-নৈতিকতার এই সমস্যাটিই আমার মতে বর্তমানে একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

আমার এই কথাটাকে আমি আর একদিক থেকেও আপনাদের বিচার করে দেখতে বলি। তা হচ্ছে, এদেশে লড়ালড়ি অনেক হয়েছে, অনেক কোরবানি জনসাধারণ করেছেন কিন্তু তার দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলন, মানুষের মুক্তি আন্দোলন এক কদমও এগোয়নি। আবার একথাও আপনারা মনে রাখবেন, আজ যা অবস্থা চলছে, কালই হয়তো না-খাওয়া মানুষগুলো আবার বোমার মতো এখানে-সেখানে ফেটে পড়তে পারে, দু'দিনের জন্য তুলকালাম কাণ্ড করে তুলতে পারে, প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে তারা রেল উপড়ে ফেলে দিতে পারে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে, কলকাতায় বা বিভিন্ন শহরগুলোতে দু-চার দিনের জন্য চরম উত্তেজনামূলক কাণ্ডকারখানা সৃষ্টি করতে পারে, বহু লাঠি-গুলি চলতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, তার দ্বারা বিপ্লব হবে না। কারণ আমি আগেও বলেছি যে বিপ্লব আর বিক্ষোভ এক নয়। বিপ্লব হচ্ছে সঠিক আদর্শ এবং সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে রাজনৈতিকভাবে সচেতন জনসাধারণের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত, সংঘবদ্ধ, সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান উন্নত নীতি-নৈতিকতা, সঠিক রাজনৈতিক লাইন এবং আদর্শের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করার মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠতে পারলেই তবে বিপ্লব হয়। তার আগে পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের নামে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' খেলা হয়, বিপ্লব হয় না। বরং তার দ্বারা মানুষের মধ্যে বিপ্লব করবার যে শক্তিটি নিহিত রয়েছে, যে সম্ভাবনা রয়েছে, লড়াই করবার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, মনুষ্যত্বের অবশিষ্টাংশ আজও যতটুকু রয়েছে, তাকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়।

চেষ্টা করলে আজও উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে মানুষকে জাগানো সম্ভব

আমি মনে করি, মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার অবশিষ্টাংশ যতটুকু রয়েছে, তাকে জাগিয়ে দিলে আজও সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। চেষ্টা করলে মানুষের মধ্যে আজও এমন মানসিকতার সৃষ্টি করে দেওয়া যেতে পারে যে, বাবাকে খেতে দিতে না পারলে হয়তো চোখ দিয়ে জল পড়বে, কিন্তু তবুও অন্যায় করতে সে চাইবে না, যেমন করে আগের দিনে আমরা ভেবেছি। আমাদের মধ্যে সেদিন অনেককে, বহু লোককে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন অবস্থা গিয়েছে যে, বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সন্তান, যার রোজগারের ওপর পিতার নির্ভর না করলে চলবে না, তাকে না খেয়ে থাকতে হবে, এমনকী চোখের সামনে বাবাকে হয়তো না খেয়ে থাকতেও দেখেছে, তবু পুত্রের বিচারবুদ্ধি গোলমাল হয়নি। এমন নয় যে পিতার সঙ্গে পুত্রের ভাল সম্পর্ক নেই, তাহলেও ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে তার ভাল সম্পর্ক রয়েছে, মায়ের সঙ্গে গভীর স্নেহের সম্পর্ক রয়েছে, তারা আদরে-যত্নে ঐ গরিবি অবস্থার মধ্যেই তাকে মানুষ করেছে এবং মনের ভিতর থেকে সেই পিতামাতা সম্পর্কে তার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে, তবু তার বিচারবুদ্ধি গোলমাল হয়নি। পিতার দিক থেকে আবেদন এসেছে, 'তুই আমাকে না দেখলে আমি খাব কী করে? আমি কি বৃদ্ধ বয়সে না খেয়ে মরে যাব?' পিতার কথা শুনে পুত্রের চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে, কিন্তু যুক্তি গোলমাল হয়নি। অতি সহজেই তার কাছ থেকে উত্তর বেরিয়ে এসেছে, চোখের জল ফেলতেই ফেলতেই সে বলেছে, 'শুধু তুমি নয়, আজ দেশের ঘরে ঘরে প্রতিটি বাবা-মা'র এই অবস্থা। আমি যে-রাস্তায় চলেছি, তাতে যদি সফল হই, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে তোমার মতো এমন করে কোন বাপ-মাকে পুত্রের অন্নের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হবে না বা বৃদ্ধ বয়সে পুত্র যদি খাওয়ায়ও, পুত্রবধূ এবং পুত্রের যে অপমানের অন্ন ঘরে ঘরে লাচার বাবা-মায়েরা আজকে মুখে তুলছে, তেমন অপমানের অন্ন তাদের মুখে তুলতে হবে না। তখন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ভাল হবে, মাতা-পুত্রের সম্পর্কও ভাল হবে। নাহলে, আজকের সমাজে যে পুত্রের সঙ্গে ছোট অবস্থায় বাবা-মার ভাল সম্পর্ক থাকে, যে পুত্রকে সুন্দর করে তারা মানুষ করে — বড় হওয়ার পর পাঁচটা জিনিসকে কেন্দ্র করে সেই পুত্রের অধঃপতন হওয়ার ফলে, বা যাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে সেই স্ত্রীর চাপে পড়ে অথবা নানান জটিলতার মধ্যে পড়ে মা-বাবাকে উপযুক্ত সম্মানটি সে আর দিতে পারে না। পুত্রের ঘরে, পুত্রবধূর সংসারে মা প্রায় দাসীর স্তরে চলে যায়। তাকে পুত্রবধূর মন জুগিয়ে দু'টি অন্নের সংস্থান করতে হয়। আজ যদি মাতা-পিতার পুত্রের ওপর এই আর্থিক নির্ভরশীলতা না থাকত, তাহলে পুত্রবধূর এবং পুত্রের এই অবমাননার হাত থেকে তারা রক্ষা পেত। তাই বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে যাতে কারোর উপর নির্ভরশীল না হতে হয়, কোনও বাবা-মাকে যেন না খেয়ে মরতে না হয়, তেমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি লড়ছি। তাহলে বাধা দিচ্ছ কেন? যদি এমন হত যে, তোমাদের না খাইয়ে রেখে নিজের চিন্তা করছি, বা বিয়ে-থাওয়া করে তোমাদের ফেলে রেখে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্য কোথাও একটা বেশ ভাল জায়গায় গিয়ে উঠেছি, তোমাদের দেখিনি, তাহলে বলতে পারতে। বল, আমি কি অন্যায় কাজ করছি? তাছাড়া এইভাবে ভাব না কেন, যদি আমি মরে যেতাম। টাইফয়েডে মরা তো এদেশে কেউ রক্ষা করতে পারে না। সাপের কামড়ে মরা তো কেউ রক্ষা করতে পারে না। ওলাওঠায় মরে যাওয়া তো কেউ রক্ষা করতে পারে না। তাহলে তোমাদের একমাত্র সন্তান আমি যদি মরে যেতাম, তোমাদের কে খাওয়াতো?' এইভাবে ঘরে ঘরে ছেলেরা সেদিন উত্তর করেছে এবং এই উত্তর করে সেদিন তারা স্বদেশি আন্দোলনে বেরিয়ে এসেছে বলে বাবা-মাকে হয়তো খেতে দিতে পারেনি, কিন্তু তারা দুঃস্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেনি যে, বাবা-মাকে অশ্রদ্ধা করা যায়। এ তারা করেনি। বাবা-মাকে অসম্মান তারা করেনি, যদিও বাবা-মাকে তারা খেতে দিতে পারেনি। কিন্তু আজ যে ছেলে বাবা-মাকে খেতেও দেয়, সেই ছেলের স্ত্রী-ই হয়তো মাকে অপমান করে, বাবাকে অপমানের অন্ন মুখে তুলতে হয়। এইরকম একটা পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সেদিন ছেলেরা লড়েছে।

আজকের আন্দোলনের পরিপূরক নীতি-নৈতিকতার ধারণা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে

এই যে নৈতিক বলটি, এটি সমাজের মধ্যে সেদিন ছিল তো? যদি না থাকতো, সেইদিনের সেই ছেলেরা এইসব উত্তরগুলো এমন সহজভাবে পেত কী করে? কে তাদের ধরিয়ে দিত? অথচ আজও যে ছেলেপিলেরা উত্তর করে না তা তো নয়, উল্‌টোভাবে উত্তর করে। যেমন করে এই নৈতিক বলটি না থাকার জন্যই আজ আন্দোলন না করার কারণ হিসাবে অতি সহজেই সি পি আই (এম) নেতাদের কাছ থেকে উত্তরটা বেরিয়ে

আসছে যে, পুলিশ যেহেতু ওদের পিছনে রয়েছে, আন্দোলন করতে গেলে মারবে, সেইহেতু এখন আন্দোলন হতে পারে না। কেমন সহজে যুক্তিটা আসছে। এ যুক্তিটাও তো তাদের কাছ থেকে আসতে পারত যে, পুলিশ তো আসবেই, পুলিশের বিরুদ্ধেই তো শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে — যদি সেই লড়াইয়ের মোকাবিলাই করতে না পারি, তবে মনুষ্যত্বের দাবি করছি কী করে? তাহলে মানুষ বলে নিজেকে ভাবছি কী করে? আগে এটুকু চেতনা তো গড়ে উঠবে, তারপরে তো বিপ্লবী! তারপরে তো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী! নাহলে মানুষ নামেরই তো যোগ্য নই। অথচ যেখানে অত্যাচার সহ্য করতে হবে বলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেন না — সেখানে তাঁরাই আবার হলেন জনগণের সেনাপতি, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং বিপ্লবী। আবার, লক্ষ্য করলে দেখবেন, তাঁরা তাঁদের এই আন্দোলন না করার কারণকে কখনও কখনও কৌশল বলে চালাচ্ছেন। তা আমি বলি, 'স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট' (কৌশলগত পশ্চাদপসরণের) মানে কি কাপুরুষতা নাকি? লড়াই করতে করতে কোন একটা সময়ে কৌশলগতভাবে পিছিয়ে আসতেও হতে পারে, কিন্তু সে তো কাপুরুষতাজনিত নয়। অথচ তাঁরা যা করছেন, সে তো 'পিওর অ্যান্ড সিম্পল্' (নির্ভেজাল) কাপুরুষতা। আপনারা মনে রাখবেন, কাপুরুষতার দ্বারা কিছু হয় না। আন্দোলন করতে গেলে যদি মারে, মারবে। ফ্যাসিস্টরা বিপ্লবের শক্তিকে মেরে মেরে ধ্বংস করে দিতে চায়নি? কিন্তু পেরেছে নাকি নষ্ট করে দিতে? ছাত্ররা এবং যুবকরা যদি এইভাবে ভাবতে না পারেন, না অভ্যস্ত হন এবং যাঁরা লড়তে আসবেন, তাঁরা একটা সুনির্দিষ্ট নীতি-নৈতিকতা এবং সংস্কৃতির সুর নিজেদের মধ্যে এবং দেশের মধ্যে গড়ে তুলতে এবং ছড়িয়ে দিতে না পারেন, তাহলে সত্যিকারের আন্দোলন গড়ে উঠবে কী করে?

ফলে, যথার্থই যাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইবেন, দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের পরিপূরক একটা নীতি-নৈতিকতার মান গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই তাঁদের সচেষ্ট হতে হবে। যদিও আপনাদের মনে রাখতে হবে, এই নীতি-নৈতিকতার ধারণাটি হবে, আজ যে আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে চাইছি তার পরিপূরক, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, একে অপরের সাহায্যকারী। কিন্তু সুবিধাবাদ কখনই নয় — আন্দোলনের পরিপূরক নীতি-নৈতিকতার ধারণা নিশ্চয়ই চাই। কারণ কোন সত্যিকারের আন্দোলনই নীতি-নৈতিকতা ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। তাই চাই আন্দোলনের উপযোগী নতুন নীতি-নৈতিকতা, চাই উন্নত রুচি-সংস্কৃতির মান। আবার, মনে রাখবেন, 'শুধু লড়ব' এই মনোভাব থেকে নানা দাবি নিয়ে যে লড়াইগুলো এদেশে গড়ে উঠেছে, শুধু এই ধরনের লড়াই দিয়েও বিশেষ কিছু হবে না। এই ধরনের লড়াইয়ের ওপর আমার বিশেষ আস্থা নেই। আমি জানি, এরকম লড়াই এদেশে অতীতে অনেক হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। এগুলো গড়ে উঠবে, আবার চলে যাবে, আবার হবে, আবার চলে যাবে। কিন্তু এইসব লড়াইগুলোর মধ্য দিয়েই আপনা-আপনি বিপ্লব হয়ে যাবে — এরকম হয় না। লড়াইগুলোর মধ্য দিয়েই আপনা-আপনিই বিপ্লব হয় না, বা মানুষগুলো না খেয়ে থাকলেই বিপ্লব করবে — এ হয় না। আমি আগেই বলেছি, না খেয়ে থাকলে মানুষ ওয়াগন-ব্রেকার হতে পারে, চোর হতে পারে, ছ্যাঁচোড় হতে পারে, ডাকাত হতে পারে, ভিক্ষুক হতে পারে — বিপ্লবী হবে না। বিপ্লব করতে হলে আর্থিক দাবিদাওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে লড়াইগুলো গড়ে উঠবে, সেই লড়াইগুলোর সঙ্গে আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক লাইনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ

বিহারে যে আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও, আপনারা মনে রাখবেন, এই একই প্রশ্ন জড়িত। সেখানে আন্দোলনের মধ্যে থেকে আপনারা ডি এস ও'র তরফ থেকে সাধ্যমত এই কাজগুলো কীভাবে করবেন — সেটা একটা কৌশলগত প্রশ্ন। কিন্তু এই কাজগুলো আপনাদের করতে হবে। আপনাদের প্রথমত দেখাতে হবে, সেখানে জনসাধারণ যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে, বা নানা দাবি নিয়ে লড়ছে, সেই সমস্যাগুলোর জন্ম হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে। পুঁজিবাদের সঙ্গে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া, সেখানে নানা দাবিদাওয়া নিয়ে লড়তে লড়তে আন্দোলনের মধ্যে আর একটা দাবিও এসে গেছে, তা হচ্ছে, বিধানসভা ভেঙে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি। মনে রাখবেন, এটাও গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই একটা দাবি। কারণ একটা সরকার জনগণের পক্ষে কাজ করছে না — ফলে, তাকে ভাঙবার জন্য অবশ্যই লড়তে হবে। কিন্তু বিধানসভা ভাঙার দাবি নিয়ে বা একটা বিশেষ সরকারের অপসারণের দাবি

নিয়ে এই লড়াই করার সাথে সাথেই আপনাদের নিজেদেরও বুঝতে হবে এবং অন্যদেরও দেখাতে হবে, এই দাবিগুলো 'ইন্‌সিডেন্টাল' অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক, মূল সমস্যা নয়। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা সরকার পাল্‌টে আর একটা সরকার গঠন করলেই জনসাধারণের সমস্ত দাবি পূরণ হয়ে যাবে না। কারণ তাদের সমস্যাগুলির মৌলিক সমাধানের প্রশ্ন বিধানসভা ভাঙাগড়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, পুঁজিবাদের ভাঙাগড়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, ব্রিটিশ আমলে একটা ইংরেজ অফিসার খুব অত্যাচার করেছে — তাকে মেরে তাড়াবার পরিকল্পনা হয়েছে, চেষ্টা হয়েছে। এর থেকে অনেকে ভাবতে শুরু করলেন যে, এই রকম কিছু অফিসার মেরে তাড়ালেই বুঝি ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, যার থেকেই 'টেররিজমে'র (সন্ত্রাসবাদের) জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এই রকম কিছু অফিসারকে গুলি করে মারলেই কি ইংরাজ রাজত্ব চলে যেত? যেত না। কারণ সেদিন মূল সমস্যাটা ছিল ইংরেজ রাজত্ব, পরাধীনতা — মানে একটা 'সিস্‌টেম' বা ব্যবস্থা, যেটাকে হঠাতে হবে। তেমনি আজকেও মূল সমস্যাটা হচ্ছে পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকলে যারাই সরকারে যাক — তারা যত সৎ হোক, তাদের যত স্বপ্ন থাকুক, যত পরিকল্পনা থাকুক — কোন সমস্যারই মৌলিক সমাধান তারা করতে পারবে না।

যেমন, জহরলালেরও একদিন স্বপ্ন ছিল, পরিকল্পনা ছিল। ছিল না, একথা বলা শক্ত। কিন্তু কী করতে পেরেছেন তিনি? সৎ লোক দু-চারজন কি কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন না? তাঁরা কী করতে পেরেছেন? বরং ক্রমে ক্রমে তাঁরা নিজেরাই একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন অথবা তাঁরা 'ইগোসেন্ট্রিক' (আত্মম্ভরী) হয়ে গিয়েছেন, বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন, 'র‍্যাশনালাইজ' (মনগড়া সব যুক্তি) করতে করতে একদিন পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে উল্‌টো বকতে শুরু করেছেন, ভুলেই গিয়েছেন একদিন কী স্বপ্ন তাঁরা দেখতেন। এই যে 'সেল্‌ফ্ র‍্যাশনালাইজেশন' (মনগড়া সুবিধামত যুক্তি) শুরু হয় মানুষের খুব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায়, মনে রাখবেন, তার দ্বারা একটা মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে পাল্‌টাতে থাকে এবং একদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বনে যায়। সে ধারণাই করতে পারে না একদিন যে স্বপ্ন নিয়ে সে শুরু করেছিল, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বনে গিয়েছে। ফলে, একজন কী চাইছেন, তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে, সেই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সমস্যার চরিত্র তিনি ঠিকমত ধরতে পেরেছেন কি না এবং তাকে সমাধান করার জন্য সঠিক রাস্তাটি নির্ণয় করতে পেরেছেন কি না। এটা যদি করতে না পারেন, তাহলে শুধু চাওয়ার দ্বারাই তিনি সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। তেমনি আজকে যাঁরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে সেখানে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন, তাঁদেরও এই দাবিগুলো আদায়ের লড়াই করতে করতেই মূল সমস্যার চরিত্রকে জানতে হবে। তাঁদের বুঝতে হবে, জনজীবনের সমস্ত সমস্যাগুলোই আজ পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে, যাঁরা আন্দোলন পরিচালনা করছেন, সেই আন্দোলনের নেতৃত্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাল্‌টাবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না, তা আমাদের বিচার করতে হবে। দেখতে হবে, তেমন আদর্শ সেই নেতৃত্বের আছে কি না। নাহলে, শুধু 'চাষী-মজুরকে নিয়ে লড়' — একথা বললেই হবে না।

সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে গণআন্দোলনকে সঠিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

আর একটা কথাও এ প্রসঙ্গে আপনাদের মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, কোন আন্দোলনে চাষী-মজুর এলেই সেই আন্দোলন প্রগতিশীল হয়ে যায় না। যেমন, বিহার আন্দোলনে একদল প্রশ্ন তুলেছেন যে, যেহেতু এই আন্দোলনে শ্রমিক নেই, সেহেতু এটা প্রগতিশীল আন্দোলনই নয়। যাঁরা এই প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরা মূল বিষয়টিকেই গোলমাল করে ফেলছেন। আন্দোলনে শ্রমিক আই এন টি ইউ সি-ও আনে। তাহলেই কি সে আন্দোলন প্রগতিশীল হয়ে যায় নাকি? জনসংঘ চাষী নিয়ে আসে না? যেখানে জনসাধারণ অসংগঠিত, তার হাজার একটা অভাব রয়েছে, সেখানে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চেতনা না থাকার জন্য তাদের উত্তেজিত করে, যে কেউ সংগঠিত করে একটা আন্দোলনে নিয়ে আসতে পারে। কাজেই, আন্দোলনে মজুর-চাষী এলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রগতিশীল আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন হয়ে যায় না। আবার, আর এক ধরনের বিভ্রান্তিও বিহার আন্দোলনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেখানে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে আন্দোলনে এসেছে, তারা কতকগুলি 'জেনুইন গ্রিভ্যান্স' (ন্যায্য দাবি) নিয়ে লড়ছে, কিন্তু নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে এই নেতৃত্ব থাকার জন্য একদল বলছেন, এটা কোন আন্দোলনই নয়, এই আন্দোলন পরিত্যাগ কর। আমি মনে করি, যাঁরা এই কথা বলছেন, তাঁরা ঠিক বলছেন না। এ দুটোই ভ্রান্ত ধারণা। সঠিক

ধারণা হচ্ছে, জনসাধারণ যদি ন্যায্য দাবি নিয়ে, একটা আর্থিক দাবিকে কেন্দ্র করেও আন্দোলনে আসে, তাহলে নেতৃত্ব যার হাতেই থাকুক, এমনকী বিপথগামীদের, প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে থাকলেও, বিপ্লবীদের কাজ হচ্ছে — প্রথমত, সেই আন্দোলনে জনগণের মধ্য থেকে আন্দোলনের 'ফারভার' (উদ্দীপনা) কাজে লাগিয়ে, তার ধারাটা এবং 'টিউন'টাকে (সুরটাকে) কী প্রক্রিয়ায় তারা ঘোরাতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পারে, তার চেষ্টা করা। কিন্তু যাঁরা সত্যিসত্যিই আন্দোলন চান — শুধু মুখে আন্দোলনের কথা বলেন, তেমন নয় — তাঁরা কোনমতেই প্রতিক্রিয়াশীলরা আছে বলে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, যে শিক্ষাটাকে নিয়ে তাঁরা আন্দোলনের মধ্যে যাবেন, সেটা শুধু শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করানো এবং আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকদের কতকগুলো দাবি উত্থাপন করাই নয়, তাদের কাজ হবে, শ্রমিক-চাষী তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে যে লড়ছে, সেই লড়াইয়ের রাজনৈতিক চেতনাটি উপযুক্ত পরিমাণে গড়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা। অর্থাৎ এইসব লড়াইগুলো আসলে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের সঙ্গে কীভাবে সম্বন্ধযুক্ত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গেই সমস্ত সমস্যা কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে — তা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের মধ্যে কারা দক্ষিণপন্থী, কারা মডারেট, কারা মেকি বিপ্লবী, মেকি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্ব, সেইটা জনসাধারণকে বিচার করে নিতে সাহায্য করতে হবে। এইগুলোই হচ্ছে বিপ্লবীদের আসল করণীয় কাজ।

ডি এস ও কর্মীদের একই সঙ্গে তিনটি জিনিসের চর্চা করতে হবে

এখন এই কাজটি বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে কারা করতে পারে? কারা সেই শক্তি? সেই শক্তি হচ্ছে এস ইউ সি আই এবং ছাত্রসংগঠনগুলির মধ্যে ডি এস ও। আপনাদের, ডি এস ও কর্মীদের, এই কাজটি করতে হলে তিনটি জিনিস একসঙ্গে চর্চা করতে হবে। প্রথমত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আপনাদের গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং সেটা সাধারণভাবে নয়। আপনাদের মনে রাখতে হবে, শুধু মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের কতকগুলো 'ইউনির্ভাসাল' (সাধারণ সর্বজনীন) ভাষ্য আয়ত্ত করার নাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করা নয়। ভারতবর্ষের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশেষীকৃত প্রয়োগ পদ্ধতি কী হবে এবং তাকে বিশেষভাবে কোথায় কতটুকু 'এন্‌রিচ্' (উন্নত করা), 'ইলাবরেট' (সম্প্রসারিত করা), বা 'কংক্রিটাইজ' (বিশেষীকৃত) করার দরকার আছে, তা আপনাদের বুঝতে হবে। আর 'সিয়ুডো মার্কসইজ্‌ম্' (মেকি মার্কসবাদ), 'স্যাম মার্কসইজ্‌ম্' (ভূয়া মার্কসবাদ) বা সংশোধনবাদ থেকে যথার্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পার্থক্য কী এবং কোথায় এবং এক একটা বিশেষ আন্দোলনের মধ্যে, সংযুক্ত আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলনের স্লোগান বা কর্মসূচি আপাতদৃষ্টিতে এক হলেও সত্যিকারের বিপ্লবীদের সঙ্গে মেকি মার্কসবাদীদের আন্দোলন সংক্রান্ত 'অ্যাঙ্গুলারিটি' (দৃষ্টিভঙ্গি), 'অ্যাপ্রোচ' (কায়দাকানুন) ও কলাকৌশলগত পার্থক্য কী — তা আপনাদের আলাদা করে বুঝতে হবে, শিখতে হবে। এই হচ্ছে প্রথম জিনিস যেটা আপনাদের করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আন্দোলনের আদর্শ এবং মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন ঠিক রাখার বিষয়টিও এই একই 'ক্যাটিগরি'র মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত, আপনাদের সাহসী হতে হবে, 'ডিটারমাইন্ড্' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) হতে হবে এবং চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তৃতীয়ত, আপনাদের রাজনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে এবং সকলের আগে নিতে হবে এবং নিজেদের এই উদ্যোগকে সবসময় জীবন্ত রাখতে হবে। এর মানে হচ্ছে, আপনারা উদ্যোগ নিতে কোন সময়ই পিছিয়ে পড়েননি। যেমন ধরুন, আন্দোলনের একটা 'ইস্যু' এসেছে, অথবা দেখা যাচ্ছে, একটা ইস্যু তুললে জনসাধারণ সেটা নেবে — এরকম অবস্থায় অন্য কেউ সেই ইস্যু-টা তোলবার আগেই যাতে আপনারা জনসাধারণের মধ্যে ইস্যু-টা তুলে জনসাধারণকে সংগঠিত করে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন — আপনাদের উদ্যোগ সেরকম হওয়া চাই। কেউ ডাকার অপেক্ষায়, জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষায়, বা আপনাদের পাঠাবার অপেক্ষায়, 'কনট্যাক্ট্' (যোগাযোগ) দেওয়ার অপেক্ষায় জবুথবু হয়ে আপনাদের বসে থাকতে হয় না। তাছাড়া আপনাদের যোগাযোগ পাওয়ার কী দরকার আছে? আপনারা তো আর একা একা একটা জায়গায় থাকেন না — আপনাদের চারপাশে কোটি কোটি লোক রয়েছে। কাজেই যোগাযোগের কী দরকার আছে? যোগাযোগ পেলে কাজের সুবিধা হয় ঠিকই। কিন্তু যোগাযোগ না পেলে আপনাদের 'আইসোলেটেড' (বিচ্ছিন্ন) হয়ে বসে থাকতে হয় এবং যোগাযোগ নেই বলে আপনারা কাজ করতে পারেন না — এরকম হবে কেন?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে বিপ্লবের আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইন চিনে নিতে হবে

তাহলে, তিনটি জিনিস আপনাদের হাতিয়ার করে চলা দরকার। একটা হচ্ছে, 'ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন অ্যান্ড রি-লার্ন, এডুকেট্ অ্যান্ড রি-এডুকেট্ ইয়োরসেল্ফ্' — অর্থাৎ, আপনাদের পড়তে হবে এবং বারবার করে পড়তে হবে, বারবার করে শিখতে হবে এবং জানতে হবে একই কথা। কারণ, যতবার পড়বেন, তত উন্নতরূপে, তত ভালভাবে, তত গভীরে তার উপলব্ধি আপনাদের মধ্যে ঘটতে থাকবে। অনেকের এরকম একটা ধারণা আছে যে, একবার একটা জিনিস পড়া হয়ে গেলেই তো সেটা বোঝা হয়ে গেল, আবার দ্বিতীয়বার সেই জিনিসটা পড়ার দরকার নেই। অর্থাৎ তাঁরা ধরে নেন, তাঁরা যখন বিষয়টা একবার পড়েছেন, তখন আর পড়বার দরকার কী? এটা ভুল ধারণা। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই আমি বলি। একই সাহিত্য, একই লেনিনের বই, একই মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং-এর বই নানা সময়ে পড়তে গিয়ে প্রথমে যা বুঝেছি, কয়েকবার পড়ার পর পড়তে গিয়ে তার অর্থ নতুনভাবে আমার কাছে ধরা পড়েছে। প্রথমের বোঝাটা ভুল হয়েছে, একথা বলছি না। কিন্তু কয়েকবার পড়ার পর যে জিনিসটা ধরা পড়েছে, সেটা নিশ্চিতরূপে আগের চাইতে উন্নত উপলব্ধি। ফলে, যত বারবার করে পড়বেন, তত আপনাদের উপলব্ধি ভাল হবে। সাথে সাথে দলের আদর্শ, ডি এস ও'র আদর্শ এবং সাধারণভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বললেও ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে তার বিশেষীকৃত রূপ কী এবং বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক লাইন কী, তা আপনাদের বুঝতে হবে। একই সঙ্গে বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক লাইন সংক্রান্ত প্রশ্নে 'সিয়ুডো রেভোলিউশনারি' (মেকি বিপ্লবীদের) সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায়, তা-ও আপনাদের বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে যারা ভারতবর্ষের বিপ্লবকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলছেন, তাদের সঙ্গে কোথায় পার্থক্য রয়েছে, শুধু সেটুকু বুঝলেই চলবে না। আমরা ছাড়াও আর যারা ভারতবর্ষের বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলছেন, তাদের সাথেও কোথায় পার্থক্য তা-ও বুঝতে হবে। কারণ পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা শুধু আমরাই বলি, তা নয়, ছোট আরও দু-একটা পার্টিও বলে। ফলে, কেউ মনে করতে পারেন যে, কথা দুটো যখন একই, তখন আমাদের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য নেই। যারা এভাবে মনে করেন, তাদের বোঝা দরকার যে — না, তা নয়। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, তারাও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলছেন, আমরাও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলছি। ফলে, তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে হবে। আবার, বিষয়টা কেউ যদি এরকম ভেবে চেপে যান যে, তারা যেহেতু ছোট, সেহেতু তাদের নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার নেই, শুধু সি পি আই(এম)-এর রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই হ'ল, আমি বলব, এ মনোভাবও ঠিক নয়। কারণ আমরাও একদিন ছোট ছিলাম। তাছাড়া আর একটা কথাও মনে রাখবেন, তা হচ্ছে নিজের রাজনীতি মানুষ তখনই ভাল বোঝে, যখন অপরের রাজনীতিটাও সে ভাল বোঝে। এ দুটো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ কথাটা একই — নিজের রাজনীতি খুব ভাল বোঝার মানে অপরের রাজনীতি খুব ভাল বোঝা। আবার, অপরের রাজনীতি তখনই একজন খুব ভাল বোঝেন, যখন নিজের রাজনীতি ভাল বোঝেন। অপরের রাজনীতি ভাল না বুঝলে প্রমাণ হয় যে, নিজের রাজনীতি বোঝার মধ্যেও ফাঁকি আছে। যে যত নিজের রাজনীতি ভাল বোঝে, সে অপরের রাজনীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি তত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে পায় এবং ভাল বোঝে। অপরের রাজনীতি ভাল না বুঝলে নিজের রাজনীতিও গোলমাল করে বোঝা হয়, ভুল বোঝা হয়। তাহলে, লড়াইয়ের মূল আদর্শ ও রাজনৈতিক লাইন এবং তারই সাথে অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে কোথায় পার্থক্য, তা ঠিক করা হচ্ছে আপনাদের প্রথম কর্তব্য।

বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সুরটি গড়ে তুলতে হবে

দ্বিতীয় কর্তব্য আপনাদের হচ্ছে, এই মূল আদর্শ এবং রাজনৈতিক লাইন ঠিক করার সাথে সাথে তার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করবার জন্য তার পরিপূরক নীতি-নৈতিকতা এবং সংস্কৃতির সুরটি গড়ে তোলা। এটা গড়ে তোলবার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে আপনাদের দরকার, সমস্ত 'অড্স্'-এর (প্রতিকূলতার) বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সবকিছু দেওয়ার মানসিকতা, এমনকী দরকার হলে প্রাণ দেওয়ারও মানসিক প্রস্তুতি। একথা ঠিক, আন্দোলন হলে, লড়ালড়ি হলে অপর পক্ষেরও দুটো ঘায়েল হবে। কিন্তু অপরপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যই আপনারা লড়তে এসেছেন, আপনাদের আন্দোলনের লক্ষ্যটা এরকম হবে না। আপনাদের মনোভাব হবে,

আপনারা প্রস্তুত হয়েই এসেছেন, দরকার হলে মরবেন। আবার, এর মানে এও নয় যে, কেউ যদি মনে করেন, তাঁরা মরবার জন্যই এসেছেন, তখন মাথা গরম করে মরে যাওয়াই হল বড় বিপ্লবী হওয়া, অর্থাৎ কোন কিছু বিচার না করেই কেউ যদি এরকম ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্যদের বলতে থাকেন যে — 'এই ভাগছিস্ কেন? এখনই এখানে লড়াই করে আয় আমরা মরে যাই, কারণ আমাদের মরে যাওয়াই কাজ' — তাহলে আমি বলব, এরকম ধারণাও সঠিক ধারণা নয়। আমি এরকম হতে বলছি না, এরকম মানসিক রুগি হতে বলছি না। কারণ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে উন্মাদের মত প্রাণত্যাগ করার নাম বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনে লড়তে গিয়ে প্রাণ দেওয়া নয়। কিন্তু একথাটা সত্য যে, আপনারা যারা লড়তে এসেছেন, দরকার হলে আপনারা মরতে পারেন, প্রথম অবস্থায় এই মনোভাব যদি আপনাদের মধ্যে খুব প্রবল না থাকে, স্থির না থাকে, আপনারা যদি শান্তভাবে এই মনোভাব গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে লড়াই, বিপ্লব — এগুলো শুধু কথার কথা, এর কোন মানে নেই। আর এই মনোভাব যদি আপনাদের থাকে, তাহলে ভীত হবার কোন কারণ আপনাদের নেই। একথা ঠিক, আপনারা একটা লড়াই করতে করতে কখনও কৌশলগত কারণে পিছিয়ে আসতে পারেন, সাময়িকভাবে লড়াই স্থগিতও রাখতে পারেন। কিন্তু সেটা এরকম নয় যে, আপনারা ভয় পেয়েছেন বা মার খাবেন বা মরে যাবেন এই ভয়ে, অথবা জেলে যাওয়ার ভয়ে লড়াই স্থগিত রেখেছেন। আপনারা লড়াইটা স্থগিত রেখেছেন অন্য কারণে, আপনাদের পিছিয়ে আসার অন্য কারণ আছে। কিন্তু দরকার হলে এক্ষুনি মরতে পারেন, এক ইঞ্চি ও নড়াতে পারবে না — এই মানসিক দৃঢ়তা প্রতিটি কর্মীর থাকা দরকার।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত রাজনৈতিক উদ্যোগ বাড়াতে হবে

তৃতীয়ত, এর সাথে চাই আপনাদের রাজনৈতিক উদ্যোগ। এই রাজনৈতিক উদ্যোগ এমন হওয়া চাই যে, প্রত্যেকেই আপনারা নিজের পরিকল্পনায় কিছু না কিছু কাজ করছেন, আপন নিয়মে জনসংযোগ করছেন, ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছেন, অন্তত আর কিছু না পারেন বহু 'সেন্টারে', বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বহু হোস্টেলে, যেখানে আপনাদের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা আপনাদের সততা ও চরিত্রের মাধুর্যে আপনাদের ভালবাসেন, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। এইটুকুও যদি আপনারা করে রাখেন, মনে রাখবেন, আন্দোলন গড়ার পক্ষে সেটাও অনেক কার্যকরী। আবার, এরই সঙ্গে আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাও আপনাদের মনে রাখা দরকার। তা হচ্ছে, কাজ হয়তো আপনারা করলেন, কিন্তু সেটা করলেন আপন নিয়মে — কাজের ধারা কখনই আপনাদের এরকম হওয়া উচিত নয়। 'প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগ চাই' — এ কথার মানে এ নয় যে, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে যার যার মত ক্রিয়া করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অর্থাৎ এই ব্যক্তিগুলোর ক্রিয়ার মধ্যে কোন সংযোগ নেই বা 'সেন্ট্রালিজম্' নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে আগে বাড়ানো, কাজকর্মের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করা — একথার যথার্থ অর্থ হচ্ছে, একই সঙ্গে 'সেন্ট্রালিজম্'-কে (একেন্দ্রীকতাকে)শক্তিশালী করা। এগুলো সেন্ট্রালিজম্-কে 'কাউন্টারপোজ' (বিরোধিতা) করার জন্য বা তাকে দুর্বল করার জন্য নয়। বরং সেন্ট্রালিজম্-কে 'মেকানাইজেশন' (যান্ত্রিকতা) থেকে মুক্ত করার জন্য 'ব্যুরোক্রেটিক' 'টেন্‌ডেন্সি' (ঝোঁক) থেকে মুক্ত করার জন্য, দলের সমস্ত কর্মীদের কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্য, সমস্ত 'রিসোর্স' (শক্তি) যা হাতের মধ্যে রয়েছে তার 'প্রপার ইউটিলাইজেশ্‌ন্'-এর (যথাযথ ব্যবহারের) জন্যই এটা অত্যন্ত দরকার। এর 'আল্‌টিমেট' (আসল) লক্ষ্য হচ্ছে, একদিকে প্রতিটি কর্মীর কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে সামগ্রিকভাবে দলীয় ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানো, অপরদিকে ব্যুরোক্রেটিক ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করে সেন্ট্রালিজম-কে শক্তিশালী করতে থাকা। মনে রাখবেন, বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। সেইজন্য আপনাদের স্লোগান হবে, 'স্টাইল অব ওয়ার্ক' (কাজের পদ্ধতি) উন্নত করতে হবে, 'স্টিরিওটাইপ ওয়ার্ক' (গতানুগতিক কাজের পদ্ধতি) পাল্‌টাতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, অবস্থা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ কাজের পদ্ধতি 'রিমোল্ড্' করতে (পাল্‌টাতে) পারেন, এমন 'ফ্লেক্সিবিলিটি' (পরিবর্তনশীলতা) আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং কাজকর্মের 'ডেমোক্রেটিক ফাংশনিং' (গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার) উপর আপনাদের জোর দিতে হবে। আর, সংগঠিতভাবে সকলে মিলে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে পারার ক্ষমতা আপনাদের আয়ত্ত করা চাই। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় যে তিনটি কথা বললাম, তার মধ্যেই এটা নিহিত রয়েছে।

বিপ্লবের একটি স্থায়ী বুনিয়াদী শক্তি হিসাবে ডি এস ও'কে গড়ে তুলুন

সর্বশেষে, আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ডি এস ও'র এত ছাত্র আপনারা রয়েছেন, তাঁরা প্রতিটি কর্মী, যদি নিজেদের উদ্যোগে আদর্শ এবং মূল রাজনৈতিক লাইনটিকে স্থির রেখে একদিকে তা বারবার বোঝবার চেষ্টা করতে থাকেন, আর একদিকে নিজেদের যতটুকু ক্ষমতা এবং বুদ্ধি আছে তা নিয়ে বসে না থেকে ছাত্রদের সঙ্গে এবং বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে আপন বুদ্ধি অনুযায়ী জনসংযোগ ঘটাতে থাকেন এবং গণআন্দোলনের কোনরকমের সম্ভাবনা থাকলে, সম্মিলিতভাবে হোক্, অথবা এককভাবে হোক্, অন্য কিছু পরোয়া না করে নিজেদের উদ্যোগে সেগুলোকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আপনারা একটি স্থায়ী বুনিয়াদী শক্তি এবং বিপ্লবের একটি ভিত্তি এদেশে সৃষ্টি করতে পারবেন। আশা করব, ডি এস ও'র যত কর্মী এখানে এসেছেন, সাহসের সঙ্গে আপনারা অবস্থার মোকাবিলা করবেন। আপনারা মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের এই একটি মাত্র দল এস ইউ সি আই এবং তার গণসংগঠনের উপর মানুষ যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করে রেখেছে। আপনারা কী করেন, গভীর আগ্রহের সাথে মানুষ সেটা লক্ষ্য করছে। তাদের মনের মধ্যে সংশয় রয়েছে যে, আপনারা ছোট, আপনারা পারবেন কি না। আপনাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু আমাদের যতটুকু শক্তি আছে, ভারতবর্ষের তুলনায় তা আজকে আর তত ক্ষুদ্র নয়, একটা কাজ শুরু করবার পক্ষে তো নয়ই। ফলে, আপনাদের এই চ্যালেঞ্জ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। ডি এস ও'র ছাত্ররা যদি এইভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, মানুষ আপনাদের কাছে যা আশা করছে অর্থাৎ আপনারা কিছু করতে পারেন, অন্যেরা কেউ কিছু করবে না — আপনারা সেই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলেন, আর আমি যে কথাগুলো আপনাদের সামনে বললাম, সেইগুলো সামনে রেখে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যদি আপনারা এই হল থেকে ফিরে যান, তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরতে থাকবে। এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য আজকে আমি শেষ করছি।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৮৪ সালের নভেম্বরে
পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।